

38. Decision making in Strategic Management: Various Streams of Influence

৩৮. কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ: প্রভাবের বিভিন্ন ধারা

ফ্লক এবং জ্যানিস কৌশলগত ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় তিনটি ভিন্ন ধারার সংমিশ্রণের উপর আলোকপাত করেছেন। এইগুলি হলো যৌক্তিক-বিশ্লেষণাত্মক (rational- analytical), অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ-আবেগিক (intuitive- emotional) এবং রাজনৈতিক-আচরণগত (political- behavioural)। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এই ধারাগুলোকে পাঁচটি ভিন্ন ধরনের বিবেচনা করলেই আরও ভাল হবে, যেমন যৌক্তিক, অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ, আবেগিক, রাজনৈতিক এবং আচরণগত। যৌক্তিক মডেলে অনুসারে যে ম্যানেজাররা সিদ্ধান্ত নেন তারা সবগুলি বিকল্প সমাধান এবং সম্ভাব্য পছন্দের ফলাফল বা পরিণতিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেন; এরপর (প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অনুযায়ী) সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মসম্পাদন মানদণ্ডের আলোকে সেই ফলাফলগুলোকে ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করেন এবং পরিশেষে এমন একটি বিকল্প বেছে নেন, যা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সর্বাধিক সহায়ক। ম্যানেজমেন্টের শিক্ষাকার্যক্রমগুলোতে মূলত এই পদ্ধতিটিই সবচেয়ে বেশি শেখানো হয় এবং এটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতি বলে মেনে নেওয়া হয়।

এই পদ্ধতিটি কিছুটা ইউটোপীয় বা আদর্শবাদী প্রকৃতির। কারণ, বিভিন্ন বিকল্প মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য (সঠিক ও নির্ভুলভাবে) হাতের কাছে পাওয়া তো দূরের কথা, সম্ভাব্য সমস্ত বিকল্পের রূপরেখা মনে মনে কল্পনা করাও অত্যন্ত কঠিন। এছাড়া, পছন্দের ক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলোকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়েও এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে, কেউ যদি অত্যন্ত কয়েকটি বিকল্প সমাধান মাথায় রাখেন বা উদ্ভাবন করেন এবং সময়, শ্রম ও ব্যয়ের সীমাবদ্ধতার গতির মধ্যেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ বা ব্যবহার করেন, তবে এই পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে একটি বাঞ্ছনীয় পন্থা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি, অতীত অভিজ্ঞতা এবং সহজাত প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়। এটি কোনো মনগড়া অনুমান বা আন্দাজ নয়। যদি যৌক্তিক মডেলকে একটি চরম প্রান্ত হিসেবে ধরা হয় এবং অনুমানকে অপর প্রান্ত ভাবা হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টির অবস্থান হবে ঠিক মাঝখানে। অন্তর্দৃষ্টি তথ্যের ঘাটতি এবং বিশ্লেষণমূলক হাতিয়ারগুলোর সীমাবদ্ধতা পূরণ করে, যা কৌশলগত ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ করে যখন কেউ কৌশল বেছে নেওয়ার সময় তার বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা শুরু করেন। কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপে হয়তো অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যবহার করা হয় না, তবে একটি সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে এটি যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আবেগের প্রভাব মূলত মনের কথা অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য, পছন্দের কৌশল, নীতি বা কর্মপরিকল্পনার প্রতি গভীর পছন্দ থাকার কারণেই হয়। যদি আবেগের এমন প্রভাব থাকে, তবে তা সমগ্র সত্যকে সেই লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে, সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে এবং প্রয়োজনে সেই উদ্দেশ্য সাধনে আত্মত্যাগ করতেও উদ্বীপ্ত করে তোলে। কৌশল বাস্তবায়নের পর্যায়ে আবেগের এই প্রভাব অপরিহার্য; কারণ এ সময় বিভিন্ন কাজ যা অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে এবং সেগুলি দ্রুত, যথাসময়ে ও সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন হয়। যদি এই আবেগ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য বা 'মিশন'-কে

কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় (যেমনটি 'অ্যাপোলো হসপিটাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড'-এর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল), তবে প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সদস্যের পক্ষ থেকে একটি সুসংহত ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। কেদারনাথ বা উত্তরাখণ্ডের ভয়াবহ বিপর্যয়ের সময় এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।

আবেগের প্রভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। এর ফলে আবেগপ্রবণ ম্যানেজারদের মধ্যে মানসিক অবসাদের হার অনেক বেড়ে যেতে পারে। এছাড়াও, তিনি অসাধু ব্যক্তিদের হাতে, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কেবল লেনদেনের সম্পর্কে বিশ্বাসী, আবেগিক ব্ল্যাকমেইলের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকিতে থাকেন।

সর্বোপরি, একটা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণের প্রতি আবেগ থাকা কৌশল প্রণয়নের জন্য উপকারী এবং সাবধান হয়ে আবেগের ব্যবহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। কারণ আন্তরিকতা ছাড়া কৌশল যান্ত্রিক হয়ে যেতে পারে এবং তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে নাও টিকে থাকতে পারে।

যদিও একটা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে আবেগ থাকা দরকার, ম্যানেজমেন্ট কৌশল নির্বাচন ও প্রণয়নের জন্য যৌক্তিক-বিশ্লেষণাত্মক মূলক ও অন্তর্দৃষ্টিমূলক মডেলের মিশ্রণ এবং এরপর বাস্তবায়নের জন্য আবেগগত মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। লক্ষ্যের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা কৌশল বাস্তবায়নের সাফল্যে আনবে।

কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর আচরণগত প্রভাব একজন ব্যক্তির আচরণের কারণে ঘটে, যা ব্যক্তিগত লাভ, যেমন আর্থিক, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি, সবচেয়ে বেশি করতে চায় এবং সহ্য করতে চায় না যে তার কোনো সহকর্মী বা অন্য কোনো ব্যক্তি ম্যানেজমেন্ট কৌশলের যুক্তিতে তাকে ছাড়িয়ে যাবে। এই মনোভাব সম্পদ (অর্থ ও অন্যান্য) বন্টন প্রক্রিয়া এবং পুরস্কার বা শাস্তি বা কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে কলুষিত করে। এর সর্বগ্রাসী প্রভাব নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে কারসাজির কারণ হতে পারে এবং ভুল ম্যানেজারকে পদে বসালে তা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ধ্বংস করতে পারে।

এসব কিছুই মূলে থাকে কেবল এক বা দুটিকয়েক ব্যক্তির কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধি, যা প্রায়ই অন্যদের স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ক্ষতির বিনিময়ে অর্জিত হয়। এর নিকৃষ্টতম রূপটি হলো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি; প্রতিযোগিতামূলক চাপের চেয়েও এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতার ওপর অনেক বেশি। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি বহু চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া করে এবং নানাবিধ কৌশলগত অসংগতির শিকার হয়। এর ফলে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও কার্যকর কর্পোরেট কৌশলগুলোকেও ব্যর্থ হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পারফরম্যান্স দুর্বল হয়। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা 'পরিবর্তন ও রূপান্তর ব্যবস্থাপনা' (managing change and transformation) বিষয়ক অধ্যায়ের জন্য মূলতবি রাখা হলো।

দলীয় অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের যে আচরণ দেখা যায়, তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বাইরের অংশীদারদের (stakeholders) চাপের থেকে আলাদা প্রকৃতির পরের অনুচ্ছেদগুলোতে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

কৌশলগত ম্যানেজমেন্টে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অভিপ্রেত নয়। যদিও রাজনৈতিক চাপ উপেক্ষা করা যায় না, কারণ একটি প্রতিষ্ঠানে (পরে বর্ণনা করা একটি সমবায় ব্যবস্থার মতো) বিভিন্ন অংশীদার থাকে, যাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট। মালিক ও উদ্যোক্তা বিনিয়োগের উপর উচ্চতর প্রতিদান (বেশি লাভ) চান, শীর্ষ নির্বাহীরা পদোন্নতির জন্য প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন, সরবরাহকারীরা উন্নততর ও দ্রুত অর্থ পরিশোধের শর্ত চান (যা খরচ বাড়ায় এবং লাভ কমায়), এবং গ্রাহকরা উন্নততর পণ্য ও কম দাম চান (যা লাভ কমায়)। এমন পরিস্থিতিতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষার কাজ হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে ন্যায্যতার (প্রত্যেকে তার অবদানের অনুপাতে প্রতিদান পাবে) নীতি অনুসরণ করতে হয়।

তবে, সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে ওঠে এই কারণে যে, প্রত্যেকের দর কষাকষির ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই ক্ষমতা নির্ধারিত হয় তার অবদান এবং তাকে সন্তুষ্ট করা পারিশ্রমিক বা প্রতিদানের অনুপাতের মাধ্যমে (যা অন্য কেউ যা চাইছে তার সমান নাও হতে পারে)।

এই অনুপাতের সঠিক বিচার কৌশলবিদকে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম করে, এমনকি কোনো সময়ে অবদানের জন্য কাউকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিদান দিলেও। তবে, যদি তাদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি সমতার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, তবে তারা অন্যদের চেয়ে বেশি বা সমান পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে, যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। বিভিন্ন অংশীদারকে প্রকৃত পারিশ্রমিক বা প্রতিদান দেওয়ার চেয়ে একজন কৌশলবিদের কাছে সমতা বজায় রাখার বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রক্ষার জন্য কম পারিশ্রমিকেও (এমনকি কোনো প্রতিদান না দেওয়াও) প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের কথা ভেবে মেনে নিতে পারে।